৫৫.C

দৈনিক বাংলা

019

তারিখ 04 JUL 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...3... ...

১৯ শে আষাঢ় ১৩৯৪

এসএসসির ফল: কয়েকটি প্রশ্ন

—সমদর্শী

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডে এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এই ফল গতানুগতিক, মোটামুটি গত কয়েক বছরের ধারারই পুনরাবৃত্তি। বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে এবারও ফেল করেছে। ঢাকা বোর্ড অপেক্ষা অন্যান্য বোর্ড বিশেষ করে কুমিল্লা ও রাজশাহী বোর্ডের ফল ভাল—মেধা ও পাসের হার দুটোতেই। ক্যাডেট কলেজগুলি বরাবরের মত এবারও ভাল ফল করেছে, মেধা তালিকায় চার বোর্ডেই তাদের প্রাধান্য।

ব্যতিক্রম বা উজ্জ্বলতর কোন কিছু একেবারেই নেই, তা নয়। এ বছর প্রথম বিভাগে পাসের সংখ্যা বেড়েছে, কমেছে তৃতীয় বিভাগ। ৮৫ সাল থেকে এবার ১৪,৩৪৮ জন এবং ৮৬ সাল অপেক্ষা ৩১৮ জন বেশি প্রথম বিভাগ পেয়েছে। এ বছর প্রথম বিভাগে পাস করেছে মোট ৩৫,৮৬২ জন। ৮৬, ৮৫ ও ৮৪ সালে এই বিভাগে পাস করেছিল যথাক্রমে ৩৫৫৪৪ জন, ২১৫১৪ জন ও ১৯,৫০০ জন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে গত বছরের চেয়ে এবারের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮৭৯ জন কম। ৮৫ সাল থেকে ৪০৯৬১ জন বেশি। এ বছর তৃতীয় বিভাগে মোট ৩৪২৮৮ জন পাস করেছে। ৮৬ ও ৮৫ সালে তৃতীয় বিভাগ পেয়েছিল ৩৬৪৩১ জন ও ৩২,৩০৬ জন। ৮৭, ৮৬ ও ৮৫ সালে পরীক্ষা দেয় যথাক্রমে মোট ৩,৬০,৫০২ জন, ৩,৬৬,৩৮১ জন ও ৩,১৯,৫৪১ জন। প্রথম বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তৃতীয় বিভাগে হ্রাস পাওয়া নিঃসন্দেহে একটি সুলক্ষণ। শিক্ষার মানউন্নয়নের সূচনার প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এটা।

এসএসসি পরীক্ষা জনজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই পরীক্ষায় পাশ-ফেল এদেশের বহু মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কাদের কপালে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ঘটবে, অফিস আদালতের চাকরি জুটবে এবং সমাজে সম্মানের আসন অধিকার করবে, এসএসসি পরীক্ষা পর্যায়ে তা অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়। কারণ যাই হোক, আমাদের সমাজে আজও সম্মানজনক আয়ের পেশা হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরির স্থানই প্রধান। স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য এত যে হুড়োহুড়ি, এত যে ধরাধরি, স্কুল-কলেজের সীট নিয়ে এত যে কাড়াকাড়ি এবং পরীক্ষা পাসের জন্য এত যে ফন্দি-ফিকির—তার একটাই উদ্দেশ্য—সার্টিফিকেট বাগানো। আর সার্টিফিকেট হল চাকরির নামক 'সোনার খনির' চাবিকাঠি। এই চাবি হাতে পাবার জন্য এসএসসির পুলছে-রাত পার হতেই হয়। আগেকার দিনে এন্ট্রান্স (আজকের এসএসসি) পাসের ভীষণ দাম ও গুরুত্ব ছিল। তখন কেউ এন্ট্রান্স পাস করলে তাকে দেখার জন্য দশ গাঁয়ের লোক তার বাড়িতে ভেঙ্গে পড়ত, বেড়ে যেত তার বাড়ির ও বংশের মর্যাদা। আজ অবশ্য ঘরে ঘরে এসএসসি পাস ছেলেমেয়ে, এমনকি এমএ, বিএ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারও অনেক। আছে অসংখ্য বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী মেয়ে-পুরুষ। এরপরও কিন্তু আজও এসএসসির বিরাট গুরুত্ব রয়ে গেছে। এই গুরুত্ব ছাত্রছাত্রীদের কাছে, তাদের অভিভাবকদের কাছে।

সবাই চায়—এই পরীক্ষার ফল ভাল হোক। ভাল ফল না হলে ভাল কলেজে ভর্তির কোন সুযোগ যে পাওয়া যায় না।

জাতির জন্যও এসএসসি পরীক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অগ্রগতির জন্য শিক্ষিত জনশক্তি অপরিহার্য। এই পর্যায়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা যথাযথভাবে চললে, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলে এবং পরীক্ষার্থীদের মেধার সঠিক মূল্যায়ন ঘটলে জাতির শিক্ষার ভিত্তি প্রসারিত ও সুদৃঢ় হয়, শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটে এবং মেধার বিকাশও ঘটে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের।

গুরুত্বপূর্ণ এসএসসি পরীক্ষা গত বেশ কিছু বছর ধরে নানা রকম দুঃখজনক প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। নকলের হিড়িক এই পরীক্ষাকে অনেকটা প্রহসনে পর্যবসিত করে ফেলেছে। গণটোকাটুকি, খাতা-বদল, বাহির থেকে সাহায্য, কেন্দ্র পরিবর্তন, শহরের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার জন্য মফঃস্বলে বা গ্রামে গমন ইত্যাদি অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়া দরকার।

প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসির ফল প্রকাশিত হলে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নগুলি হল, এত ছেলেমেয়ে কেন ফেল করে? বিভিন্ন বোর্ডের পাসের হারে এত পার্থক্য কেন? স্থানভেদে, বোর্ডভেদে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধারও তারতম্য আছে কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এবারের এসএসসিরই ফলের কথা ধরা যাক না। এ বছর মোট ৩৬০৫০২ জন পরীক্ষা দিয়েছে। এর মধ্যে পাস করেছে ২,১৫,৬০৯ জন। পাসের গড় হার শতকরা ৫৯.৮১। অর্থাৎ ফেল করেছে ৪০.১৯ শতাংশ বা ১৪৪৮৯৩ জন। এত ছেলেমেয়ে ফেল করল কেন? তারা কি এসএসসি পরীক্ষার উপযুক্ত নয়? তাদের কি যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই না করেই পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়েছিল? এই যারা ফেল করল, তাদের গতি কী হবে? বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের দিনে আরেকটি বছরের লেখাপড়ার খরচ যোগাবার সামর্থ্য কি আছে তাদের সবার? উন্নত দেশসমূহে কিন্তু এই পর্যায়ের পরীক্ষায় এমন বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কোথাও ফেল করে না। অবশ্য সেখানকার শিক্ষার ব্যবস্থাটিও ভিন্ন। এই পর্যায়ে এসেই মেধা ও ঝোঁক অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করা হয়, আটকিয়ে রাখা হয় না কাউকেই।

এ বছর ৪টি বোর্ডের পাসের হার: ঢাকা বোর্ড ৫৬.৬৩%, যশোর ৫৬.৪৪%, রাজশাহী ৬১.৬৮% ও কুমিল্লা ৬৫.১৮% পাসের হারে সবার উপরে কুমিল্লা এবং সবার নিচে যশোর। ঢাকা বোর্ড যশোরের কাছাকাছি। প্রথম বিভাগে পাসের হার তুলনামূলকভাবে ঢাকার কম। ঢাকায় যেখানে মোট ১,১৩,২৫৮ জন পরীক্ষা দিয়েছে, সেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ মিলিয়ে পাস করেছে ৬৩,০৪৬ জন এবং প্রথম বিভাগে ১০,১৮০ জন। রাজশাহী বোর্ডে পরীক্ষা দিয়েছে ৮৭,৫৭৩ জন। এর মধ্যে মোট ও প্রথম বিভাগে পাস করেছে যথাক্রমে ৫২,৫৬১ জন ও ৮,৬০২ জন। যশোর বোর্ডের ৭৮,৫৭৩ জনের মধ্যে ৪৪,৪৬০ জন পাস করেছে। প্রথম বিভাগে গেছে ৮,০৯১ জন। কুমিল্লায় পরীক্ষা দিয়েছিল ৮৫,৯১২ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৮,৯৮৯ জনসহ মোট ৫৫,৫৪২ জন পাস করেছে। চার বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে রাজশাহীর প্রথম স্থান অধিকারী—৮৪৬। যশোর, ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের প্রথম স্থান অধিকারীরা পেয়েছে যথাক্রমে ৮৪৫ নম্বর, ৮৪৬ নম্বর ও ৮৩২ নম্বর।

এ চিত্র থেকে যে বিষয়টি প্রকাশ পাচ্ছে, তা হল দেশের সব জায়গার ছেলেমেয়েদের মেধা সম্ভবত সুষম নয়। রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ নম্বর পেতে পারে, পাসের হার বেশি হতে পারে কুমিল্লার। এটা এমনিতে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু বছর বছর একই ঘটনা ঘটলে মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে—রাজশাহী, কুমিল্লার ছাত্রছাত্রীরা কি বেশি মেধাবী? কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস যে ভিন্ন। প্রায় সবারই ধারণা, ঢাকা বোর্ডেই নানা বাস্তব কারণে বেশি সংখ্যক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ ঘটে। লেখাপড়া ও ভাল রেজাল্টের জন্য এখানকার স্কুল-কলেজগুলিরই নাম-ডাকও বেশি। তা হলে ফলের ক্ষেত্রে এমন তারতম্য ঘটছে কেন? মেধার আধিক্য, না পরীক্ষার খাতা দেখার কড়াকড়ি এর জন্য দায়ী, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এটা খতিয়ে দেখা উচিত। একথা আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি। কিন্তু কেউ বুঝতে চান বলে মনে হয় না। এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের প্রথম পর্যায়ের পাবলিক এগজামিনেশন সম্পর্কে জনমনে সংশয় সৃষ্টি হবে। এছাড়া মেধাতালিকায় কয়েকটি হাতেগোনা স্কুল-কলেজের প্রাধান্যও জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দেশের সবখানে মেধার সুষম বিকাশ ঘটাতে হবে, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে, সবখানে। শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে অভিন্ন। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করা হলে নকলপ্রবণতা যেমন বন্ধ হবে, তেমনি রোধ হবে বোর্ডে বোর্ডে পাসের হারের ব্যাখ্যাতীত পার্থক্য। ছেলেমেয়েদের মেধার যথার্থ বিকাশ, মেধার সঠিক মূল্যায়ন এবং পাবলিক এগজামিনেশনের বিশ্বাসযোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। অন্যথায় একদিন সত্যিকার প্রহসনেই পরিণত হবে এসএসসি, এইচএসসি ইত্যাদি পরীক্ষা, কঠিন হয়েই থাকবে শিক্ষার মানউন্নয়ন।